দৈনিক মাধুকর | সোমবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৭৫ | ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা | ৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪ মুল্য ৩ টাকা | ৭ এপ্রিল ২০২৫ইং | শেষ পৃষ্ঠা

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৫

"জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত"

"Healthy Beginnings, Hopeful Futures"

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ৭ এপ্রিল ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

শিশুর বিকাশ ও মায়ের স্বাস্থ্য

আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এ বছরের স্বাস্থ্য দিবসটির প্রতিপাদ্য "জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত" ("Healthy Beginnings, Hopeful Futures")। প্রতিপাদ্যের আলোকে এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল ভাবনা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য। সুস্থ পরিবার সমাজের ভিত্তি, যা আমাদের সকলের জন্য আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের ওপর বছরব্যাপি প্রচারণা শুরু হবে। মায়েদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা শিশুর শারীরিক গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মায়ের মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষন্নতা শিশুর প্রাক-জন্মকালীন যত্ন ও পুষ্টিকে প্রভাবিত করে, শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভকালীন মায়ের মানসিক চাপ কিংবা উদ্বেগের ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। মা মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর বেলায়ও অসুবিধা হতে পারে। গর্ভে থাকাকালীন মা যদি মানসিক চাপ, বিষণ্নতা, উদ্বেগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন, সে ক্ষেত্রে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে যে কোনো কাজ বুঝতে, কথা বলতে, সে অনুযায়ী সাড়া দিতে, লেখাপড়া করতে কিংবা কোনো দক্ষতা অর্জনে দেরি হয়। শিশুর সঙ্গে যখন মা আনন্দ নিয়ে কথা বলেন; গল্প, ছড়া ও গান করেন, শিশু তাতে খুব আগ্রহী হয়। মাকে সে অনুকরণ করে ও তাতে সাড়া দেয়। ফলে মায়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মা নিজে যখন সঠিক ও ইতিবাচক উপায়ে তাঁর নিজের আবেগগুলোকে ম্যানেজ করতে পারবেন, শিশুও মাকে দেখে সেগুলো শিখে সেই অনুযায়ী নিজের আবেগকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে যায়।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। সেইসাথে স্বাস্থ্য খাতের সব শাখায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের স্বাস্থ্যসূচকে অগ্রগতি হয়েছে।

দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা আয়োজনে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, সুস্থ পরিবার সমাজের ভিত্তি, তাই এসকেএস ফাউন্ডেশন সকল শিশুর জন্য আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়কের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য, মায়েদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা শিশুর শারীরিক গঠন ও বিকাশে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৫ সফল হোক।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যক্তি অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ

আশরাফুল আলম

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা আমাদের আচরণ, অনুভূতি, অন্যদের সাথে সম্পর্ক এবং প্রতিদিনের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার সক্ষমতাসহ মনের শান্তি এবং সামাজিক ভারসাম্যকে বোঝাই। আমরা জীবন যাপনে কীভাবে আচরণ করি এবং প্রতিক্রিয়া জানাই, তা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত; যা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মনকে সতেজ এবং দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা। মানসিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যক্তি-জীবনে নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলি রপ্ত করা প্রয়োজনঃ

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকাঃ মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবশ্যই শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে হবে। যেমন- হালকা থেকে মাঝারি ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়াম শুধুমাত্র মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে না, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

সামাজিক সংযোগঃ আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ এবং মানষিক চাপ ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করা বন্ধন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী।

ধ্যান/চিন্তাঃ মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্বাধীন চিন্তা বা ধ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ইতিবাচক চিন্তা ধূমপানের মতো খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতেও সাহায্য করে এবং চাপ ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত রাখে।

অনুভূতি বিনিময়ঃ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নানা ধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুভূতি থাকে যা অনেক সময় আমরা লজ্জা বা অধিক বিপদের সম্ভাবনায় কারো সাথে বিনিময় করতে পারি না। যদি দুঃশ্চিন্তা হয় তবে বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই নিকটতম বন্ধু অথবা বিশ্বস্ত আত্মীয়ের সাথে কথা বলতে হবে, যাতে করে অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার মতো মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণঃ স্বাস্থ্যকর খাবার মনে শক্তি দেয় এবং মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। আমাদেরকে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য সেরা খাদ্য যেমন তাজা ফল, সবুজ শাক সবজি, বাদাম, অ্যাভোকাডো এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুব সহায়ক।

বিনোদনঃ বিনোদোন মানসিক স্বাস্থের জন্য খুবই দরকারী। পছন্দ অনুযায়ী প্রিয় গান শোনা, মুভি দেখা অথবা অন্য কোনো ধরনের বিনোদন মানসিক স্বাস্থের জন্য উপকারী। কখনো কখনো বড় ফাঁকাস্থানে অথবা প্রকৃতিক উদ্যানে হাঁটা যেতে পারে।

নিজের জন্য সময় ব্যয় করাঃ আজকাল ব্যস্ত লাইফস্টাইল। প্রতিটি মানুষকে কাজের জন্য এবং অর্থ উপার্জনের জন্য সারাক্ষণ ছুটতে হয়। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবশ্যই ব্যস্ত সময়সূচি থেকে নিজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে; যাতে মনে প্রাশান্তি আসে।

সঠিক নিয়মে ঘুমানোঃ সারাদিন সক্রিয় এবং সতেজ থাকার জন্য দিনে ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো শরীর ও মনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিমিত ও গভীর ঘুম শেষে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মোবাইল ফোনের অতি ব্যবহার পরিহারঃ মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি সময় ব্যয় করা উদ্বেগ এবং চাপের কারণ হতে পারে। সুতরাং মোবাইল ফোন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ব্যবহার কম করে প্রকৃতি, প্রিয়জন, বন্ধু ও পরিবারের সাথে সময় কাটান উচিত।

খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করাঃ অনেক মানুষ আছে যারা পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে না। সবসময় যে কোনো সমস্যা আলোচনা করা উচিত যাতে একটি সহজ সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

দৈনন্দিন রুটিনে ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারে। প্রয়োজনে চিকিত্সার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুরক্ষিত জন্ম, আলোকিত ভবিষ্যৎ: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে মাতৃস্বাস্থ্যের ভাবনা

ডা. আরমিনা খাতুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। এই দিবসটির মূল উদ্দেশ্য হলো সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। কারণ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এই খাতে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে।

এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Healthy beginnings, hopeful futures" অর্থাৎ "জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত"। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে প্রতি ১ লক্ষ জীবিত জন্মে ১৫৩ জন মায়ের মৃত্যু হয় (তথ্যঃ SVRS 2022)। মাতৃ মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ, একলাম্পসিয়া, ইনফেকশন ও বিলম্বিত ও বাঁধাগ্রস্ত প্রসব।

এখনো বাংলাদেশের প্রতি ১০০ জনে ৫০ জন নারী বাড়িতে বাচ্চা জন্ম দেন। ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় বিভিন্ন প্রসবকালীন জটিলতা; যার মধ্যে অন্যতম প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ। এটি এমন একটি জটিলতা যাতে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের একজন মা যখন বাড়িতে প্রসব করতে গিয়ে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের শিকার হন, অধিকাংশ মা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে তিনটি বিলম্ব- সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, যানবাহন প্রস্তুত করতে বিলম্ব এবং সেবাকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা পেতে বিলম্ব। এই তিনটি বিলম্ব যদি আমরা রোধ করতে পারি তবে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু

অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বাড়িতে সন্তান প্রসবের আরেকটি বড় জটিলতা হল অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা। অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা যা সাধারণত গর্ভাবস্থার জটিলতা হিসেবে ঘটে। এটি একধরনের চিরস্থায়ী শারীরিক আঘাত, যেখানে গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসবের সময় দীর্ঘস্থায়ী এবং বাধাগ্রস্ত প্রসবের কারণে মূত্রথলি অথবা মলদ্বারের সাথে জরায়ুর সংযোগ ঘটে; যার ফলে মাসিকের রাস্তা দিয়ে অনবরত মূত্র বা মল বা উভয়ই নির্গত হতে থাকে। এ জটিলতাতে আক্রান্ত নারীটি সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রেই নারীটি হয়ে পড়েন স্বামী পরিত্যাক্তা। এটি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন জটিল অস্ত্রোপচার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যার ব্যয়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে আক্রান্ত পরিবারের বহন ক্ষমতার বাইরে। এমতাবস্থায় আক্রান্ত নারীটি সমাজ এবং সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করেন।

প্রতিটি জন্মকে সুরক্ষিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির কোন বিকল্প নেই। সরকার ইতিমধ্যেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা আরো বেগবান করা প্রয়োজন। সেই সাথে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সর্বত অংশগ্রহণ ছাড়া এ কর্মযজ্ঞ সরকারের একার পক্ষে সফল করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি জন্মকে সুরক্ষিত করে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সকল সচেতন নাগরিকের এগিয়ে আসা আবশ্যক।

লেখক: চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্যকর্মী।

প্রতিরোধযোগ্য মা ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে পরিবারের ভূমিকা

হরিপদ রায়

মা ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর অংশীদার দেশসমূহ মায়েদের স্বাস্থ্যকর গর্ভাবস্থা, নিরাপদ প্রসব এবং স্বল্প পরিসরে প্রসবোত্তর স্বাস্থ্যসেবা চলমান রেখেছে। যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত সময়ে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামনের দিনগুলিতে আমাদের সকলকে কার্যকরী গর্ভকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব ও আরও উন্নত প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি ও প্রচারাভিযান চালিয়ে যেতে হবে। কেননা, বিশ্বব্যাপী মা ও নবজাতকের মৃত্যুর পরিসংখ্যানটা এখনও ভয়াবহ। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ৩০০০০০ নারী গর্ভাবস্থা বা প্রসবকালীন সময়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। আবার ২ মিলিয়নেরও বেশি শিশু তাদের জন্মের ১ম মাসেই মারা যায় এবং প্রায় ২ মিলিয়ন মৃত জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রতি ৭ সেকেন্ডে বিশ্বব্যাপী ১ জন নবজাতকের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু হয়। বর্তমানে নবজাতকের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন নবজাতকের মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আমাদের কাছে দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে। অপরদিকে, বিশ্বব্যাপী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে মাতৃ মৃত্যুর হার < ৭০ এ নামিয়ে আনাও অসম্ভব হবে।

এসডিজি অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হলে নারীর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে এবং মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দকে সমর্থন ও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গর্ভবতী মায়ের পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে। যাতে পরিবার থেকেই মায়েদের গর্ভকালীন উচ্চমানের স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা এবং সন্তান জন্মদানের পর প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে মা'কে সহযোগিতা ও অগ্রাধিকার প্রদান করে। এছাড়াও মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এমন সমস্যা যেমন- প্রসব পরবর্তী জটিলতা, পরিবার পরিকল্পনা, অসংক্রামক রোগ এমনকি মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়েও সহযোগিতা করার জন্য পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য অনুযায়ি অর্জনের জন্য বাংলাদেশও অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু অভ্যন্তরীন পটপরিবর্তন, সম্পদের অপ্রতুলতা, কর্মসূচি বাস্তবায়নে দক্ষ নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া অতি মহামারি সময়মত লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতিকে শ্লথ করেছে। তদুপরি বর্তমান ধারাবাহিকতা ২০৩০ সালের মধ্যে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হার কমানোর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। এটা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, সরকারি ও বেসরকারিভাবে গৃহীত কর্মসূচিতে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা কেন্দ্রগুলিতে মানসম্পন্ন অবকাঠামো ও দক্ষ জনবলের অভাবে কাঙ্খিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশলগত কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে গর্ভবতী মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা এবং গর্ভবতী মায়ের পরিবারে স্বাস্থ্যকর আচরন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দৃশ্যমান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কিন্তু পরিবারই গর্ভবতী মায়ের প্রাথমিক পরিচর্যা কেন্দ্র। পরিবারই মা ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার থেকেই মা ও নবজাতকের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয়। শুধুমাত্র নিবিড়ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবারকে দায়িত্ববোধ ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলে মা ও নবজাতকের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। গর্ভবতী মায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করে গৃহীত কর্মসূচির গুরুত্ব ও পরিবার কিভাবে মা ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে ভূমিকা রাখে নিচে তা আলোচনা করা হলো।

গর্ভবতী মায়ের গর্ভাবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ হলে গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানো সহজতর হয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা গর্ভবতী মায়ের প্রসব পূর্ববর্তী সেবা এবং নির্ধারিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে প্রসব সম্পন্ন হলে মা ও নবজাতক উভয়েরই সুস্থতা নিশ্চিত হয়। মা ও নবজাতকের সুস্থতা একটি পরিবারে কখনই উপেক্ষিত হয় না, থাক না তাতে অনেক খরচের বিষয়। পরিবার ও পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সদস্যদের গর্ভবতী মায়ের নিয়মিত প্রসব পূর্ববর্তী সেবা গ্রহণের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হলে, পরিবার থেকেই গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ প্রসবের পরিকল্পনা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একজন ডাক্তার, নার্স কিংবা একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিত ধাত্রী (ডিপ্লোমা ওয়াইফ) এর কাছে গর্ভবতী মা তার প্রসব পূর্ববর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নিরাপদ প্রসব সেবা গ্রহণ করলে মায়ের সম্ভাব্য জটিলতা ও করণীয় নির্ধারন করা সম্ভব হয়। ফলে মা ও নবজাতক উভয়ের মৃত্যুঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। অপরদিকে, হাতুড়ে কিংবা অদক্ষ কারও কাছে গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও প্রসব সেবা গ্রহণকালে উদ্ভূত জটিলতা এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয় না। গর্ভধারণ একটি পরিবারের আমানত এবং সুস্থ মা ও সুস্থ নবজাতক পেতে দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে গর্ভকালীন সেবা ও নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপদ প্রসব সেবা গ্রহণ করা অতি আবশ্যক। সচেতনতা থাকলে, পরিবার কখনই মা ও নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াতে হাতুড়ের ডাক্তারের শরনাপন্ন হবে না।

গর্ভবতী মায়ের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিত করার জন্য পূর্বে থেকেই প্রসবের জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্বাচন, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা'কে পরিবহনের পরিকল্পনা ও নগদ অর্থের ব্যবস্থা পরিবার থেকেই করতে হবে। গর্ভবতী মায়ের পরিবারকে আগে থেকেই সচেতন করতে পারলে, মা ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে সকল কার্যকরী পরিকল্পনা তাদের মাধ্যমেই গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

পরিবারের সদস্যরাই গর্ভবতী মায়ের সব থেকে নিকটতম পরিচর্যাকারী। তাই মায়ের গর্ভকালীন সম্ভাব্য জটিলতা সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের অবগত হওয়া প্রয়োজন। জটিলতার গুরুত্ব বুঝে কখন মা'কে হাসপাতালে নিতে হবে, সে বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের ধারণা প্রদান করা জরুরি। বিশেষকরে গর্ভবতী মায়ের ৫টি বিপদ চিহ্ন যেমন: হঠাৎ রক্তপাত, খিচুনি, চোখে ঝাপসা দেখা বা তীব্র মাথাব্যাথা, ভীষন জ্বর এবং বিলম্বিত প্রসব। বিপদ চিহ্ন জানা থাকলে মায়ের জটিলতা সংক্রান্ত চিকিৎসা সহায়তা নেওয়ার জন্য পরিবার থেকে সময়মত ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব। এতে মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

মা এবং গর্ভস্থ বিকাশমান শিশু উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য গর্ভবতী মায়ের সহজলভ্য এবং সুষম ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। গর্ভবতী মায়ের সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানোর ক্ষেত্রে সুষম পুষ্টি জরুরি। এছাড়াও গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় মায়ের সংক্রমন প্রতিরোধে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহায়ক ভূমিকা রাখে। গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি ও পরিষ্কার-পরিছন্নতা পরিবার থেকেই নিশ্চিত করা সম্ভব। পারিবারিক পুষ্টি সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস মা ও নবজাতকের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু হ্রাসে সুফল বয়ে আনবে।

গর্ভকালীন সময়ে নিয়মিত বিশ্রাম মায়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি। গর্ভকালীন সময়ে বিশ্রাম অনেক জটিলতা নিরসনে এবং গর্ভস্থ শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়াও মা ও পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ যেমন: ধুমপান কিংবা তামাক সেবন এবং পরিবারের অন্যান্যদের গর্ভবতী মায়ের সংস্পর্শে ধুমপান ও তামাক সেবন গর্ভস্থ শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর জটিলতার জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে মায়ের পরিবারের আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানো সম্ভব। পরিবারের বাইরের কেউ এমনকি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী গর্ভবতী মায়ের বিশ্রাম নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে না। এটা পরিবারের মা-শ্বাশুড়িদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এ জন্য মা ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে গর্ভবতী মায়ের নিয়মিত বিশ্রাম ও স্বাস্থকর আচরণ বিষয়ে সচেতনতা এবং পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা এবং পছন্দমত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে নারীদের পছন্দ ও মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। যা একজন গর্ভবতী মায়ের প্রসব পরবর্তী উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। আবার সময়মত প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করলে মা বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যগত জটিলতায় ভোগেন। এতে নবজাতকের পরিচর্যা ও মায়ের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। নতুন মায়েদের ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ও শারিরীক বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি হয়। যেহেতু মা হওয়া তার জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা এবং নিকটতম সময়ে আবার গর্ভধারণ তার জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ, এক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে মা'কে প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করে নবজাতকের সুস্থতা ও মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অনুপস্থিতি, নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পরিবারের বাধাদান, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি অবহেলা, নারীর প্রতি অসম আচরণ বহুলাংশে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর কারণ। পরিবারের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো সম্ভব হলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতসহ নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সর্বোপরি, সরকার গৃহীত কর্মসূচিতে পরিবারকেন্দ্রিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ পারিবারিকভাবে মা ও নবজাতকের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে এমন নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রনয়ণের জন্য সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সহায়তা ও তাদের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

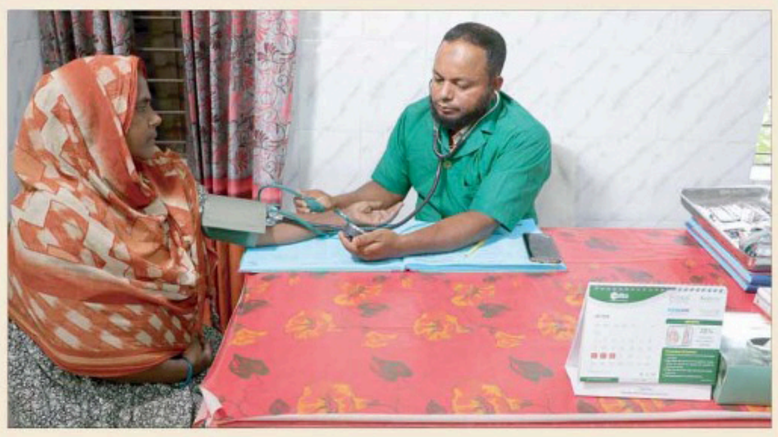

নারী স্বাস্থ্য

ডা. এসি সাহা

নারীদের স্বাস্থ্য হলো জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের একটি উদাহরণ। সেখানে স্বাস্থ্যকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ) দ্বারা "সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা এবং শুধুমাত্র রোগ বা দূর্বলতার অনুপস্থিতি নয়" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যে কোন সুস্থ ও বিকাশশীল সমাজ তৈরির প্রাথমিক কারিগর সেই সমাজের মেয়েরা। তাই মেয়েদের সুস্থ থাকা এবং সুস্থ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগামী ভবিষ্যৎ- এর জন্যে। একটি মেয়ে জন্মের শুরু থেকেই তার ভেতরে ভবিষ্যৎ মাতৃস